পরিবিষয়ী

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ ও অনুসৃজন

আমেরিকায় নানা জায়গায় কবিতা পড়ার সময় একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে হয় সবসময়ে। 'আপনার কাছে অনুসৃজন কি ? কেন আপনি নিজের ইংরেজী কবিতাকে অনুসৃজন বলেন ?' যেমন সম্প্রতি ঘটলো মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য পাঠের আসরে। ইংরেজীতে কখনো লিখতাম না। যদিও অনুবাদ করতাম দু-তরফাই। যে সব জীবিত মার্কিন কবির কবিতা অনুবাদ করতাম, তাঁদের সাথে আলোচনার মধ্যে দিয়েই। এঁরা, বিশেষত সমকালীন ও তরুণতররা, এক সময় আমার নিজের লেখা সম্বন্ধে আগ্রহী হলেন স্বাভাবিক কৌতূহলে। যেহেতু দু-তরফাই অনুবাদ করতাম, একদিন নিজের কবিতাও অনুবাদ করতে বসলাম। মুহূর্তে বুঝলাম এ প্রায় অসম্ভব কাজ।

অনুবাদ সম্বন্ধে গড়পড়তা বাঙালীর একটা নাক-শিটকানো আছে, যেমন পাঠকের, তেমনি লেখকের। যা এই একুশ শতকে খুবই সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গী মনে হয়। একদিন কথায় কথায় অঙ্কুরদা (সাহা) বলছিলেন, ' বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদক হলো তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক'। অনুবাদ কর্মকে সৃষ্টিশীল ভাবা হয়না, যাকে creative misreading বা সৃষ্টিধর্মী পাঠত্রুটি বলা যায়, তার কোনো জায়গাই গ'ড়ে ওঠেনি বাংলা সাহিত্যে। অথচ অতীত ভারতের বহু সাহিত্য ও শিল্পকর্ম এইভাবে, যৌথরচনা ও অনুরচনার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। যেহেতু আমাদের কবিতা শেখানো হয় - 'এখানে কবি কি বলতে চেয়েছেন বা কবি কি ভেবেছেন' শ্রেণীর জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ভাবা হয় যিনি আক্ষরিক অনুবাদ করেন বা তাতে বিশ্বাস রাখেন। অনুবাদ আর ভাষান্তর এক জিনিস নয়, অনুবাদ এক প্রক্রিয়া যা সেই বিচিত্র টানেলের মতো নদীর নীচ দিয়ে আমাদের ওপারে বা অন্য এক ভূখন্ডে অন্য শহরে নিয়ে গিয়ে তোলে আর আমরা বাস বা ট্রেন থেকে নেমে চোখ মেলে চমকে যাই। আক্ষরিক অনুবাদ বেশিরভাগ সময়ে সেটা করতে ব্যর্থ হয়।

যেটা লক্ষ্যভাষা (target language) আর যেটা সূত্রভাষা (source language) - এই দুটো ভাষার তদানীন্তন সাহিত্যের রূপরেখা সম্বন্ধে অনুবাদকের একটা ভালো ধারণা থাকা দরকার। শুধু ইংরেজী ভাষা জানা থাকলেই ইংরেজীতে/ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা উচিত নয়। কোনো একটা ইংরেজী ভাষাও এই পৃথিবীতে নেই। অস্ট্রেলিয়, মার্কিন, দক্ষিণ আফ্রিকান, কানাডীয়, ক্যারিবিয়ান, ভারতীয়, ব্রিটিশ - প্রত্যেকটা ইংরেজী ভিন্ন। যেমন ধরা যাক, যাঁর ইংরেজী কবিতার বিদ্যা টি এস এলিয়টে এসে শেষ হয়ে গেছে, সাম্প্রতিক মার্কিন বা কানাডার (বা এমনকি ব্রিটিশ) কোনো কবিতার অনুবাদে তাঁর হাত না দেওয়াই ভালো। একইভাবে কোনো সমসাময়িক বাঙালী কবির কবিতার ইংরেজী অনুবাদও তাঁর করা উচিত না কেননা বিদেশী সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার কোনখানটাতে উনি আজকের এই বাঙালী কবিকে ফেলবেন সেই ধারণা তাঁর নেই। এছাড়াও অনেকে অন্য বিদেশী ভাষার কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় ভাষান্তর/ভাবান্তর করেন মূল প্রথম ভাষাটার সম্বন্ধে এতটুকু ধারণা না রেখে। এই সমস্ত কারণে বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, জ্যোতির্ময় দত্ত - এমন ৫-৬ জন ছাড়া কারো অনুবাদ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে আজো।

ওহায়োর মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতাপাঠের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি ও অধ্যাপকদের প্রশ্নের উত্তরে আর্যনীল।

নিজের কবিতার অনুবাদে হাত দিয়ে সবচেয়ে বড়ো যে অন্তরায় এলো সেটা সংস্কৃতি সংক্রান্ত। মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পাঠে এসব বিষয় নিয়েই প্রশ্ন উঠলো। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এসেছিলো সেই সন্ধ্যায়। হলঘরে ঢুকে ভালো লাগছিলো এত

কবিতাপ্রেমী মানুষকে দেখে। কবিতা পড়ার সময় দেখলাম কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী নোট নিচ্ছেন। মজা পেলাম। অনেক সময় আমন্ত্রণকারী অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা ওঁদের বিশেষ কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব পাঠের আসরে যেতে বলেন। পরের দিন ক্লাসে আলোচনা হয়, প্রশ্নোত্তরের আসর হয়। যেসব ছাত্রছাত্রীরা কবিতাপাঠের আসরে এসেছিলেন তাদের একটু বেশী নম্বর দেওয়াও (ক্রেডিট) হয়। কবিতা বা পরীক্ষামূলক সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়ে রাখার এই সমস্ত পদ্ধতি খুব কার্যকরী।

অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া 'পরিবিষয়ী কবিতা আন্দোলনের' পোর্টফোলিও থেকে আমি একটা কবিতা পড়ি - 'ঘনবনজ'। ইংরেজি অনুসৃজনে 'woodense'। প্রতি বসন্তে সুন্দরবনে প্রায় হাজার খানেক মৌলি বাঘের ভয় অগ্রাহ্য ক'রে জীবিকার তাগিদে জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহ ক'রে আনেন। যে কয়েক সপ্তাহ তারা জঙ্গলে মৌ খোঁজেন, মৌলি-স্ত্রীরা সাময়িক বৈধব্য পালন করেন। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করা কবিতায় জঙ্গল, মৌলি, মৌলি-স্ত্রী, বাঘ, বন, সরকার, বনবিভাগ, মৌমাছি, মধু, বনবিবি প্রভৃতি বস্তু ও বিষয়ভাবনার মধ্যে জালের মতোই জটিল সামাজিক, জাগতিক, রুপকী ও নান্দনিক সম্পর্ককে অবলম্বন করে এই কবিতা। এখানে স্বভাবতই অনেক সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ এসে যায়। সুন্দরবনের গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, স্বল্পোপার্জনী স্বামীদের ওপর মৌলি-স্ত্রীদের নির্ভরতা আমেরিকার লিবারাল আর্টসের অধ্যাপিকা কি ছাত্রীর পক্ষে কতোটা বোঝা সম্ভব? আবার পাশাপাশি সম্পূর্ণ উল্টো তাৎপর্য ও প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক, পৌত্তলিক বহু-ঈশ্বরবাদের দেশ ভারত। সেখানে অসংখ্য মাতৃরূপিনী দেবী আছেন যাঁরা সমাজের চোখে সামষ্টিক ও জাগতিক ক্ষমতার প্রতিভূ। যে বাঘের ভয়ে মৌলিরা ভয়ার্ত, সেই বাঘই বনবিবির বাহন। এই নারীপ্রাধান্যের সামাজিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব বাস্তবের সম্পূর্ণ উল্টোমেরুতে। এবং সেটাও, বা এই বৈপরীত্য, বিদেশী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া কঠিন। এই সমস্ত উপাচার ও ধারনার কাঠামোকে আঁকড়ে ধ'রে যে কবিতা লতিয়ে উঠছে তার কেবল ভাষান্তর ক'রে কি লাভ! কি লাভ গাদাগাদা ফুটনোটে, অ্যানেকডোটে ভরিয়ে দেওয়া অনুবাদ-কবিতা লিখে!

ফলে আমি যেটা করি, সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যকে যখন লঙ্ঘন করা সহজ হচ্ছে না, কবিতার সেই অংশগুলো বাদ দিই। তার বদলে আসে নতুন ইংরেজী অংশ। সেটা কখনো হয়ে ওঠে বাংলা কবিতাংশের ইংরেজী অনুলিখন, কখনো সিনেমার ভয়েস-ওভারের মতো এক স্বরান্তর, কখনোবা নিজের লেখার *পাল্টিশ* আর নয়তো সম্পূর্ণ নতুন একটা ইংরেজী ছত্র। এইভাবে গড়ে ওঠে নিজেরই লেখার যেন এক বিদেশিনী সহোদরা।

মায়ামির এক অধ্যাপক আরো একটি উদাহরণ দিতে বললেন। তখন অন্য একটা প্রসঙ্গ এসে পড়লো। সেখানেও এক দেবী রয়েছেন - দুর্গা। ব্যাপারটা এইরকম। দেবী বিসর্জনের দিন গঙ্গার ঘাটে একটা চোরা ব্যাপার ঘটে যার কথা কেউ কেউ জানেন। মৃৎশিল্পীদের অনেকে সেদিন ঘাটে যান এবং কিছু লোক বা রাস্তার গরীব, অনাথ শিশুদের হাতে সামান্য কিছু গুঁজে দিয়ে ওঁরা, ওঁদেরই গড়া মায়ের বিসর্জিত মূর্তির মাথাটা কেটে আনতে বলেন। ধীমান চক্রবর্তীর বই 'কাঁচ শহরের মানুষ'-এর মলাটে বাদল পাল-কৃত এমন একটা আলোকচিত্রও আছে। দুটো লোক ডুবন্ত মায়ের কেটে আনা মাথার অর্ধেকটা গামছায় ঢেকে জল থেকে তুলে নিয়ে আসছে। এই মাথাটাই পরের বছর আবার কোনো মাতৃদেহে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

আমার একটা কবিতায় ২-৩ পংক্তিতে এই চিত্রকল্প ব্যবহার করি। নদীর মাটি দিয়ে গড়া নদীমাতৃক দেশের মায়ের মূর্তি সেই নদীতেই ফিরিয়ে দিয়ে মানবসমাজ যেমন জীবনচক্রের (circle of life) এক অপূর্ব, বিমূর্ত আচার গ'ড়ে তোলে, তেমনি ঐ বিসর্জিত মূর্তির মাথা তুলে এনে তাকে আবার মৃৎশিল্পে ব্যবহার করার মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম - এক শিল্পচক্র - circle of art। এখন প্রশ্ন হলো - কোন বিদেশী পাঠক বুঝতে পারবেন আমার ঐ দু লাইনের স্বকৃত অনুবাদ পড়ে, আমি এখানে ঠিক কি করতে চাইছি? কাজেই এই সমস্ত জায়গায়, আমি মূল পংক্তিগুলোকে বাদ দিয়েছি। বসিয়েছি নতুন পংক্তি।

আমেরিকায় অজস্র পিয়ানো কারখানা রয়েছে। তাঁরা খারাপ হয়ে যাওয়া পিয়ানোর কাঠ অনেক সময় ফেলে দেন, শস্তা দরে বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়। সেই কাঠ কিনেই আবার কোনো একটা ছোটো কারখানা, শিশু-ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেহালা বানায়। এই উদাহরণ আমায় দিয়েছিলেন এক পিয়ানো কারখানার মালিক। তখন মনে হয়েছিলো শিল্পচক্রের ঐ জায়গার মূল বাংলা দু-পংক্তি ফেলে দিয়ে, ইংরেজী অনুসৃজনে, আমি হয়তো এই পিয়ানোকাঠের ভাবনাটা সরবরাহ করতে পারতাম। এইই হলো অনুসৃজন, যা শুধু নিজের কবিতার ক্ষেত্রে নয়, অন্যের কবিতা অনুবাদ করার সময়েও কাজে লাগে।

Ω Ω ∞ ∞ ð ð

প্রায় বছর দশেক আগে একদিন সমীর রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করেছিলেন - আমেরিকায় 'ইনস্টলেশনের' কাজ কেমন হচ্ছে আজকাল। কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিনি সেদিন সমীরদাকে। কেননা আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্‌স্টলেশন বা সম্পূর্ণ ইন্‌স্টলড কবিতা তেমন চোখে পড়েনি। ইন্‌স্টলেশন বা অনুস্থাপনের ধারনাটা মূলত শিল্পক্ষেত্রে শুরু হয়, ১৯৫০ দশকের কোনো সময়ে (অন্তত আমেরিকায়)। অবশ্য এই তথ্যের বিরোধিতা করা খুব সহজ কেননা সাহিত্যের গোড়াকাল থেকে অনুস্থাপনের ব্যবহার চ'লে আসছে। পুরাণ বা ব্রহ্মসূত্রের অনেকটাই মৌলিক রচনা নয়, চ'লে আসা আপাতসূত্রহীন রচনা। আধুনিকযুগে বিষ্ণু দে ওঁর একটি কবিতায় একদিন আচমকা লিখে বসলেন - 'কাল রজনীতে ঝড় হ'য়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে'।

বছর বিশেক আগে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় একটা ছোটো আলোচনায় বিষ্ণু দে'র এই পংক্তিকে বলেছিলেন - 'রিডিমিং লাইন'। সেটা সত্যিই সমর্থনযোগ্য, কেবল এই যে ..... পংক্তিটা রবীন্দ্রনাথের।

সুতরাং অনুস্থাপন ব্যবহারের সত্যিই কোনো আদি নেই। ৫০ দশকের যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য দেশেও সাহিত্যে অনুস্থাপনের ব্যবহার বাড়তে থাকে। কিন্তু খুব আনুষ্ঠানিকভাবে (যা সমীর ও মলয় রায়চৌধুরীর প্রভাবে ১৯৯০ দশকের শেষার্ধে বাংলা কবিতায় কিছুটা হলো) লেখা এমন কবিতা চোখে পড়েনি। এখন যেহেতু চিরাচরিত শিক্ষায় না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়াকে চুরি ব'লে, সেই হেতু অনেকে অনুস্থাপন শিল্প ও সাহিত্যের 'মৌলিকতা' কে নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তোলেন। এর কোনো সহজ উত্তর দেওয়া যায় না। কেবল এক বাক্যে হয়তো বলা যায় - দাদা, বা দিদি, ঠগ বাছতে গাঁ যে উজাড় !

পৃথিবীর নানা প্রান্তের, বালিঘড়ির নানা লয়ের কাব্যসাহিত্য এলোপাথাড়ি পড়তে পড়তে আমার 'মৌলিক' সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণাটা চ'টে গেছে। অস্ট্রিয়ার এক নামী সাহিত্যিক একদা বলেছিলেন যে সাহিত্য এক গোপন পাতালনদীর মতো - একটানা ব'য়ে চলেছে নিজের মতো, আমরা, সাহিত্যিকরা কেবল যে যার নিজের বালতি নিয়ে যে যার নিজের জায়গা থেকে তার অণুমাত্র জল তুলে নিই। দ্যনিকেনের ধর্মশাস্ত্রের মতো হয়তো সমস্ত কবি বা কবিতার কোনো অ্যান্টি-ম্যাটার নেই এই পৃথিবীতে, কিন্তু ভাষা ও ভাবনার অজস্র সমব্যবহার আছে - সে জেনে হোক বা না জেনে। সমকালে না হোক অকালে, সকালে বা বিকেলে। ফলে রবি আর ওয়ার্ডস্বার্থে যেমন মিল পাওয়া যায়, তেমনি ডিকিনসন আর রবিতে, বোদলেয়ার আর পো-তে, রবি ও আন্তোনিয় মাচাদোয়, কি জীবনানন্দ ও হুইটম্যানে, ইভ বনফোয়া ও জর্জ ওপেনে - এইভাবে তালিকা পৃথিবীর বৃহত্তম ট্রেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায় - কখনো জেনেশুনে মানুষ কেন বহুশ্রুত বা পঠিত অন্যের পংক্তি লেখে ? কেন বিষ্ণু দে-কে রবীন্দ্রনাথের আঁজলা থেকে এভাবে পান করতে হলো ? বিদগ্ধ প্রাজ্ঞ মননোজ্জ্বল বিষ্ণু কেন জেনেশুনে খোলাবাজারে এমন আপাত-চৌযর্প্রবৃত্তির নিদর্শন রাখলেন ?

কারিগরি গণিত বা নিউমারিকাল ম্যাথেম্যাটিক্সের লোক হিসেবে আমার প্রতিনিয়তই মনে হয় এ জগত চূর্ণ, ডিস্ক্রিট। একটানা প্রবাহমান ব'লে সত্যিই কিছু নেই। ঐ যে পাতালনদী, সেও বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে গড়া। ভাঙতে ভাঙতে এক জায়গায় গিয়ে আর কোনো ভাঙন নেই, হ'তে পারে সে পরমার্থের আকার বিচিত্র ও আপেক্ষিক। এর কারণেই এক জায়গায় গিয়ে আকারের সাথে প্রকার মিলে যায়, নিজের ভাবনার সুপ্রকাশে অন্যের মৌল কাজে লাগে ; আমরা যে বিচ্ছিন্ন নই, অন্যের দ্বারা ক্রমাগত বাহিত, পালিত ও প্রমাণিত - এই ধারণার এক জোরালো বহিপ্রকাশ দেখি পুনরুক্তি ও পুনঃপ্রকাশে। প্রলেপের ওপর প্রলেপ চড়ে। 'রজনীগন্ধা' শব্দটাও সম্ভবত রবির সৃষ্টি, 'কাল রজনীতে.....' লাইনটাও তাঁর, তবু বিষ্ণু সেটা নেন, এতে রবির প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের প্রকাশই সোচ্চার হয়। একইভাবে হুবহু বিদেশী সুরে রবি নিজেই বেঁধেছিলেন - 'পুরানো সেই দিনের কথা'র মতো অজস্র গান। একইভাবে সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রাহুল দেব বর্মণের বহু বহু গান ও গানাংশ। আর যখন সচেতনভাবে 'মৌলিক' সাহিত্য নির্মান ক'রি আমরা, হয়তো দেখা যায় এমন 'মৌলিক' পৃথিবীর অন্যকোনোখানে অন্য একজনও এমন ক'রে ব'সে আছেন। হয়তো আমাদের অনেক আগেই। এর উদাহরণ ভুরি ভুরি। তেমন 'মৌলিক'কে আর 'অসীম মৌলিক'ও বলা যায় না। তার নাম - অজ্ঞান মৌলিক।

মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃজিত কবিতা পড়ছেন লেখক।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'স্মৃতির প্রতি' কবিতাটার কথা আবার উঠবে। বহুকাল আগে পড়া এই কবিতার প্রতি আমার নজর কাড়ে এক আমেরিকান যুবক, ২০০৭-এর সায়াহ্নে। জানতে পারি এক অপেক্ষাতর অচেনা মার্কিন কবি জর্জ অপেনের কথা, যিনি বুদ্ধদেবের সমবয়সী এবং ক্রমশ যাঁর কবিতার গুণপনা ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর নানাকোণে। অপেনের সাথে ১৯৬০-৬১ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে বুদ্ধদেবের বন্ধুত্ব হয়। নিউ ডিরেক্শন্স প্রকাশনী বুদ্ধদেবের একটা বই করার কথা

ভাবছিলো। কিন্তু ওঁর ইংরেজ-ইংরেজিকে কিছুটা আমেরিকান ক'রে নিতে অপেনকে প্রকাশনীর কর্ণধার বুদ্ধদেবের পান্ডুলিপিটা দিয়েছিলেন। অপেনের সাথে বুদ্ধদেবের আলোচনা চলতে থাকে, এক সময় নিউ ডিরেকশন্স ও বুদ্ধদেব দুজনেই হয়তো পারস্পরিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু অপেনের মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে থাকে বুদ্ধদেবের কবিতার কিছু বীজ। প্যালিমটেক্সচুয়াল বা অধিলিপিক এক পদ্ধতিকে অপেন বুদ্ধদেবের 'স্মৃতির প্রতি' কবিতাটা থেকে নিজস্ব একটা কবিতা নির্মান ক'রে নেন। এসব আমাদের অজানা ছিলো। না জানতেন কোনো বাঙালী, না কোনো আমেরিকান। আমার এই তরুণ বন্ধু - প্যাট ক্লিফোর্ড (Pat Clifford) নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে এসব তথ্য খুঁজে বের করেন। আমি যতোটা সম্ভব সাহায্য করি, বিশেষত বুদ্ধদেব-কন্যা দময়ন্তী বসু সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে। এসব কথা প্যাট ও আমি - দুজনেই বারবার লিখেছি। দুই প্রয়াত কবির ঘনিষ্ঠার ভূতটা যে আমাদের ঘাড়ে আজো চেপে ব'সে আছে সেই উত্তেজনা থেকে আমি অন্তত সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারিনি। সম্প্রতি আরো একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। আচমকাই।

অস্ট্রেলিয়ার এক নামী কবি পিটার বয়েল (Peter Boyle)। উনি একদিন লিখলেন যে আমেরিকার ফ্লোরিডায় এক কুবান কবি থাকেন - খোসে কোসের (José Kozer) ; ওঁর একটা বিখ্যাত কবিতা আছে - *অ্যানিমা, জর্জ অপেনের জন্য*। সেই কবিতা জর্জ অপেনের সেই কবিতার দ্বারা সংক্রামিত যা বুদ্ধদেবের 'স্মৃতির প্রতি' থেকে গ'ড়ে উঠেছে। পিটার ইন্টারনেটে প্যাট ক্লিফোর্ডের প্রবন্ধটা খুঁজে পান, খুঁজে পান আমাকে। উনি খোসে কোসেরের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আমায় পাঠান। কিছু প্রশ্নও আছে ওঁর বুদ্ধদেব-অপেন প্রসঙ্গে। উত্তরে আমি লিখি - বাংলা থেকে মার্কিন ইংরেজি, সেখান থেকে এস্পানিওল হ'য়ে অস্ট্রেলিয় ইংরেজির মাধ্যমে খোসের কবিতাটা কি আবার ফিরে যেতে পারেনা বুদ্ধদেবের বাংলায়? এই ফিরতি-যাত্রার সম্ভাবনায় পিটার বয়েল ও খোসে কোসের আনন্দ চেপে রাখতে পারেননি। কবিতাটা এখনো বাংলায় অনুবাদ ক'রা হয়নি সম্পূর্ণ, তাই বয়েলের অনূদিত ইংরেজিটাই দিলাম -

José Kozer

ANIMA FOR GEORGE OPPEN

Rugged landscape and, despite the excess of rugged landscape,
face like jagged rock, I spend
the morning (in transit)
reading George Oppen.

A piece of fruit the size of Buddha, I don't dare open my mouth,
nothing is bite-size, it might
be wax or lead, fruit of a
Bodhisatva, the poem of
George Oppen based on
a poem of Buddhadeva Bose,
jagged as Oppen's face, a
smooth-skinned fruit, the
flower's ovary wrinkles to
transform into fruit, I know
for certain that in the shining
brilliance I've seen the apples
of Cezanne (red yellow
red in their darkness.)

There is this guy in the train to Munich reading my book of
poems: no other voice can
be heard, a moment beyond memory,
you can hear a fly's wing
brush the hardest rock, settle
among the black ash of Fujiyama:
its buzzing embed itself into the
intimacy of metal (railway track).

We go forward, nonetheless. Page 94.
The train furiously intent on the speed
needed to reach its destination
Oh Bodhisatva.

Invocation: George Oppen, concomitant light, lift one of Cezanne's
apples to your mouth (the painting
stays intact: already it is beyond
memory): two cones of light, hunger
in unison (one omnimode) chew
the dodecahedron, from your
other side (you are dead):
(in any direction you like) spit
three seeds: three seeds, George
Oppen, and what then? Alight.
Kant has just kissed his servant
on the mouth. And in the heavens
Ephraim and Esther are the gills
of two fish opening on resurrection.
Everything is joined together. I close
the book. Next stop Marienplatz
(my fingers crossed against you,
Dachau): and beyond the tracks
as I go to meet it, where cows
graze, something extraordinarily new.

'বৃত্ত সম্পূর্ণ' হলো - এমন কক্ষনো বলবো না। Circle of life - ওটা বাজে কথা। অর্ধশিক্ষার কথা। বৃত্ত এক বিশুদ্ধতা। বাস্তব আসলে কুন্ডলী। যার মধ্যে দিয়ে জীবন এগিয়ে যায় আবার পিছিয়েও যায় এক নতুন ঘাটে যেখানে আগেও কোনোদিন কোনো এক তরী এসে ভিড়েছিলো। হয়তো অন্য কারণে। একথাও মনে রাখতে হবে - যদি অপেন তাঁর নিজের কবিতার (যা কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতার চেয়ে বহুলাংশেই আলাদা, ভাবে, প্রকাশে ও অবশ্যই ভাবনায়) শীর্ষে বুদ্ধদেবের 'স্মৃতির প্রতি'র কাছে ঋণস্বীকার না করতেন এই কুয়াশাকুন্ডলীর কথা আমরা জানতেও পারতাম না। সে হতো গবেষণার বিষয়। বেশিরভাগ কবিই এভাবে ঋণস্বীকার করেন না। আমরা সব আসলে ঐ 'না পড়িলে ধরা'র দলে নাম লেখানো 'মৌলিক' কবি।

Ω Ω ∞ ∞ ঠ ঠ

এভাবেই উঠবে 'পাস্তিশের' (pastiche) কথা। রাতের পাস্তা, অর্থাৎ যা কিনা ইতালীয় খাবার, যেটুকু বাকী পড়ে রইলো, পরের দিন মধ্যাহ্নে সেই বাসী পাস্তার সাথেই অন্যান্য বাসী রান্নার টুকরোটাকরা মিশিয়ে, আরো কিছু নতুন মশলা বা উপাদান যোগ ক'রে, ফুটিয়ে তৈরি হয় - পাস্তিচিও (pasticcio)। অনেকটা আমাদের 'খিচুড়ি' কি 'ঘ্যাঁট' বা 'লাবড়া'র মতো। সেই পাস্তিচিও থেকেই এসেছে 'পাস্তিশ' শব্দ ও ধারণা। অতীতের শিল্পের সুতো-ফিতে, খড়কুটো আজকের শিল্পী দুভাবে ব্যবহার করেন - জেনে ও না-জেনে। জেনে ব্যবহার করা শিল্পকেই যে পাস্তিশ বলা যাবে এমন নয়। চলচ্চিত্রে যার উদাহরণ ভুরি। এগুলোকে রিমেক, অ্যাডাপটেশন ইত্যাদি বলা হয়। ব্রেশটের নাটক থেকে অজিতেশ যে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' করেছিলেন তাকে কতটা পাস্তিশ বলা যায় কতটা বাঙালীকরণ এ নিয়ে তর্ক হতে পারে। একইভাবে শরৎচন্দ্রর 'দেবদাস'-এর একাধিক চলচ্চিত্রায়নকে পাস্তিশ বলা যায় না, ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরত' ছবিটাও আগাথা খ্রিস্টির গল্পের (The Mirror Crack'd from Side to Side যার শীর্ষক কিনা আবার আলফ্রেড টেনিসনের কবিতা থেকে নেওয়া) ও সেই গল্পভিত্তিক ছবির (The Mirror Crack'd) বাঙালীরূপ, পাস্তিশ নয়, ঠিক যেভাবে ব্রিটিশ শিল্পী ডোরা ক্যারিংটন ও তাঁর সাথে লেখক লিটন স্ট্র্যাচের সম্পর্ক নিয়ে, ওঁদের জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ক্যারিংটন'-ও নয় ; বরং রবার্ট বার্নসের কথা-সুর রবি যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন তাকে পাস্তিশ বলা যায় কিছুটা ; একইভাবে মোৎসার্তের প্যাস্টোরাল (সম্ভবত নবম সিম্ফনী) থেকে সলিল চৌধুরী কিশোরের জন্য 'ইতনা না মুঝসে তু পেয়ার বড়া/ কে ম্যায় ইক আশিক আওয়ারা' রচনা করেছিলেন যে পদ্ধতিতে তাকে পস্তিশ না বলে উপায় নেই। একইভাবে না-জেনেও পাস্তিশ ব্যবহার হয়, তবে সেটাকে পাস্তিশ বলা যাবে কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায়। সাহিত্য ক্ষেত্রে পাস্তিশের উদাহরণ ভুরি ভুরি।

১৯৯০ দশকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কয়েকটা পাস্তিশ গদ্য লেখেন - যেমন মার্কেজের উপন্যাস 'Love in the time of cholera' থেকে 'কলেরার দিনগুলিতে প্রেম', যাকে অন্যত্র 'স্পুফ-নভেলা' বলা হয়েছে, যদিও আমার মনে হয় পাস্তিশ-গদ্য হিসেবেই তার বর্ণনা বেশি স্বাভাবিক। এই উপন্যাসটাকে কেন্দ্র ক'রে একটা মজার স্মৃতি আছে। 'কলেরার দিনগুলিতে প্রেম'-এর একটা পার্শ্বচরিত্র তরুণ কবি আর্যনীল, যে নিয়মিত শ্মশানে যায় এবং মৃতমানুষের খুঁটিনাটি টুকে রাখে। সন্দীপন যখন বইটা লিখছিলেন সেইসময়ে আমার যাতায়াত ছিলো ওঁর চেতলার বাড়িতে। গদ্য-সম্বন্ধে পারতপক্ষে অনাগ্রহী এক উটকো তরুণ কবির সঙ্গে সন্দীপনের সেই স্নেহবৎসল বন্ধুত্বের সত্যিই কোনো মাথামুন্ডু নেই। কেবল কোনো উপন্যাসে ঐ আমার প্রথম ও শেষ রোল-প্লে। সেই সময় ওঁর আরো একটা জবাবী-প্রহসন উপন্যাস 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' পড়তে দিতেন। এবং খুঁটিয়ে পড়তে হতো। কেননা সন্দীপন সেখান থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। এই উপন্যাসকেও নেতিবাচক পাস্তিশ বলতে দ্বিধা করবোনা আজ, কেননা বইটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র প্রতি-কাহিনী। একইভাবে কয়েকজন বিখ্যাত বিশ-শতকী লেখকের নানা রচনাকে পরবর্তীকালে পাস্তিশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে হোর্হে ল্যুই বোর্খেস, মার্সেল প্রুস্ত, ফ্রান্জ কাফকা ও মিলান কুন্দেরা অন্যতম। পাস্তিশ নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। সাম্প্রতিকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জর্মণ-বংশোদ্ভূত অধ্যাপিকা ইঙ্গেবর্গ হস্টারের বইটা পশ্চিমী হলেও কোনো বিশেষ দেশ ঘেঁষা নয়। নাম - Pastiche: Cultural Memory in Art, Film, Literature (2001) ।

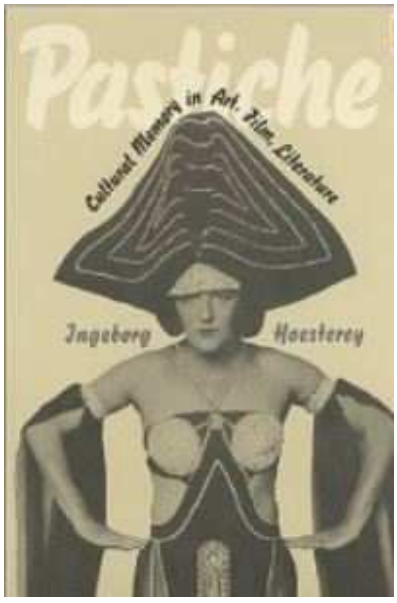

কিন্তু প্রশ্ন এই যে পাস্তিশের প্রসঙ্গ কেন তুললাম। আসলে পাস্তিশ বিভিন্ন দেশ ও কালের বেড়া টপকে গিয়ে একটা সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে অন্য রচনা বা স্মৃতির ওপর আরোপ করতে পারে। এটা কবিকে সাহায্য করে। প্রথাসিদ্ধ উচ্চারণ থেকে বেরিয়ে যাবার একটা গুপ্তদরজা খুলে দেয় পাস্তিশ, গাঢ় ঘনিষ্ঠতায় মিশতে দেয় আন্তর্জাতিক শিল্প-সাহিত্যের জগতের সাথে। বেড়াহীন ভাবে মিশতে দেয়। আর সেখান থেকেই আপাত-নতুন লেখার জন্ম। আজো যে অনেক সাহিত্য-পন্ডিত মাইকেল মধুসূদনকে বাংলার প্রথম ও পরম পরীক্ষাকবি বলেন তার কারণ কিন্তু অনেকটাই এই প্রথার বেড়িমুক্তি। দেখা যাচ্ছে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বলে প্রায় কিছুই হয়না। আবার এটাও ঠিক যে টুকলি সাহিত্য, বঙ্গায়ন ইত্যাদির সাথে পাস্তিশের একটা সূক্ষ্ম বিভাজনরেখা রয়েছে। কম-পড়ুয়া বা ফাঁকিবাজ সাহিত্যিকের সেটা চট ক'রে নজরে পড়বেনা আর সেখান থেকেই শুরু, যাকে বলা যাক লেখকের 'প্রকৃত পদস্খলন'।